# ঢাকার গল্প

মুম রহমান

ঐতিহ্য

আমার আব্বা মুসলেহ উদ্দীনকে

যিনি এই ঢাকা শহরে আমার থাকার স্থায়ী ব্যবস্থা করেছেন। যিনি ঘুমিয়ে আছেন এই ঢাকা শহরের মাটির নিচে। যিনি আমাকে শিখিয়েছেন যেখানেই থাকো, যার সাথে থাকো, ভালোবাসো। তার কারণেই হয়তো-বা এই তীব্র জামজট, কোলাহল, দূষণের এই শহরকেও আমি ভালোবাসি। আমি এই শহরের হয়েছি, এই শহর আমার হয়েছে। আমরা দুজনই ভালো নেই, তবু একসাথে আছি, থাকব। আমি জানি, আমিও একদিন এই ঢাকা শহরের মাটির নিচেই ঘুমাব অনন্তকাল। এই বইটা তাদের জন্য যারা ঘুমিয়ে আছেন চিরতরে ঢাকার বুকে।

# গল্পসূচি

ঢাকার অসুখ ৯
দুর্ঘটনা ১৬
ক্রাইসিস ২৮
ছাতা ৩৯
শিরীষ শাখায় ৪৭
এই শহরে ইভা বিবি ৫৬

# ঢাকার অসুখ

"এটা সুখবর যে, যক্ষ্মা আজকাল কারো হয় না। এক সময় হতো খুব। আমার অনেক নিকটাত্মীয় মারা গেছে যক্ষ্মায়। চেকভ, কাফকা, কিটস, সুকান্ত, ঋত্বিক ঘটক মরে গেল যক্ষ্মায়। মিথ্যা বলিনি, এরা সত্যিই আমার আত্মীয়। কারণ, এরা ছিলেন, আছেন আমার আত্মার সঙ্গী হয়ে। এক সময় 'যার হয় যক্ষ্মা তার নাই রক্ষা'– এমনই বলত সবাই। কিন্তু এ সবই ছিল অতীতকাল। তবে অতীত হলেও এ সবই দগদগে স্মৃতি। যক্ষ্মা না-থাকলে আমার অনেক নিকটাত্মীয়রা আজও বেঁচে থাকত। আমি তাদের সাথে চা খেতাম, আড্ডা দিতাম, গল্প আর গুজবে যোগ দিতাম। অথবা তারা আরো বেশি করে আমাদের জন্য রেখে যেত সম্পদ। আমরা হতাম আরো ঐশ্বর্যে পূর্ণ। আমাদের ঝুলিতে যোগ হতো আরো সব অমূল্য রতন। কিন্তু যক্ষ্মা তাদের অনেককে বিয়োগের খাতায় নিয়ে গিয়েছিল।

যাক, এতো গেল মানুষের কথা। আমার তো ইদানীং এমন মনে হয়, বর্তমানে খোদ ঢাকা শহরেরই যক্ষ্মা হয়েছে। এই শহরটা অবিরাম খোক খুক খুক খোক করে কেশেই চলেছে দিনরাত আর ঘুন ঘুনে ঘ্যান ঘ্যানে জ্বরে ভুগছে। দিব্যি দেখতে পাই, গল গল করে রক্ত পড়ছে ঢাকার বুক থেকে, মুখ থেকে। আর এই ঢাকার ফুসফুস আক্রান্ত, ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর একদিন হৃৎপিণ্ডের গতি নষ্ট হয়ে যাবে, কিডনি, লিভার কাজ করবে না। গলায় রক্ত তুলে মরবে ঢাকা। তবে কি আমার ঢাকা শহরের রক্ষা নাই? চিকিৎসার ঊর্ধ্বে চলে গেছে আমার প্রিয় ঢাকা?"

দিন নেই, রাত নেই এইসব হাবিজাবি ভাবে রোকসানা। ভাবনা এবং বেদনা ছাড়া এই মুহূর্তে তার জীবনে আর কিছু নেই। সে দেখে, নীরব, অসহায় চোখে, সবকিছু। এই যে কাঠালের ওপর মাছি ভ্যান ভ্যান করছে। নীল, বড় একটা মাছি, একদম ভনভন করে উড়ছে। আর্মির হেলিকপ্টারের

মতো লাগছে ওটাকে। মনে হচ্ছে টহলে বেরিয়েছে। রোকসানার কোন কাজ নেই। সে মাছিটার গতিবিধি দেখে। আর চেষ্টা করে মাছির পা দেখার। কয়টা পা থাকে একটা মাছির? সে কাঁঠাল পছন্দ করে না। এর গন্ধটা তার উগ্র লাগে। আর কাঁঠাল ভাঙলেই মাছি আসে। আচ্ছা, আর কোনো ফলের ক্ষেত্রে কি ভাঙা শব্দটা ব্যবহার করা হয়? হুম, নারকেল ভাঙে, কাঁঠাল ভাঙে... আর কিছু! অর্থহীন চিন্তাভাবনা করছে রোকসানা। ইদানীং এক অর্থহীনতা তাকে গ্রাস করেছে।

পা-কাটা যাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে আর কিবা করতে পারে সে? একবার ভেবেছিল আত্মহত্যা করবে। অনেক ব্যথানাশক আর ঘুমের ওষুধ দিয়েছে ডাক্তার। একসাথে সবগুলো গুলে খেয়ে ফেললে মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু তবুও মরা হয় না রোকসানার। বিছানায় শুয়ে কাঁঠালের মাছি দেখে, আর দেখে অসুস্থ-রুগ্‌ণ ঢাকাকে।

খুবই শীঘ্রই রোকসানার আলগা পা লাগানো হবে। ঠিকঠাক চেষ্টা করলেই পাজামা দিয়ে ঢাকা আলগা পা নিয়েই সে হাঁটতে পারবে। হয়তো প্লাস্টিকের সেই পায়ে আর চুমু খাবে না কেউ, নূপুর পরাবে না কেউ, আলতা পরানো হবে কৃত্রিম পায়ে।। কিন্তু রোকসানা একদিন আলগা পা নিয়ে মৃদু খুঁড়িয়ে হাঁটবে, যদি মরে না যায়।

মৃদু শব্দটা কী সুন্দর! আর মরে যাওয়া শব্দটা কী বিশ্রী!

এক সময় এই ঢাকা শহরটা খুব মৃদুমধুর ছিল। টুংটাং করে হঠাৎ রিকশা চলত, আইসক্রিমের বাক্স মাথায় নিয়ে ঘণ্টা বাজাতো আইসক্রিমওয়ালা, বাহারি পোশাকের চানাচুরওয়ালা চোঙা ফুঁকত। বিশাল আর বিশ্রী কিছু ছিল না এ শহরে। চোখের সামনে বিরাট হট্টগোল আর দালানের শহর হয়ে গেল ছোট্ট ঢাকা। ডাইনোসরের মতো দালান উঠল, কোটি টাকা দামের গাড়ি জামে বসে ধুঁকতে থাকল। জানালার খোপগুলো ভরে গেল এসির বাক্সে আর চোখের সামনেই দূষিত হয়ে গেল ঢাকার ফুসফুস।

এখন যক্ষ্মা রোগীর মতো দিনে রাতে হাঁপাচ্ছে, ফোঁপাচ্ছে, কাশছে পুরো ঢাকা শহর। এই ঢাকার কি কোন মুক্তি নাই? কোনো দিন সুস্থ হবে না ঢাকা?

-ওষুধ খাইছ?

রোকসানা কোনো উত্তর দেয় না। ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে। কথা বলতে তার ভালো লাগে না।

আগে হলে, কাজল চেঁচিয়ে উঠত, কথা কও না ক্যা! ভং ধরছ! ঝিম মারা লোক আমার পছন্দ না। কিন্তু কাজল এখন চেঁচায় না। সবসময় মিষ্টি সুরে কথা বলে। রোকসানা আগে জানলে নিজেই নিজের পা কেটে ফেলত, তাতে

অন্তত কাজলের এই মিষ্টি ব্যবহারটা উপভোগ করতে পারত আরো আগে থেকেই। কিন্তু ব্যবহার যত মিষ্টিই হোক, কাজলের কষ্ট হয়ে যায়। অনেক কষ্ট হয়। ছেলেরা কি এইসব পারে? টয়লেট করানো, মুখে তুলে খাবার খাইয়ে দেওয়া? কাজল অবশ্য ভালোই পারে, না পেরে উপায় কি! নিরুপায় হলে মানুষকে অনেক কিছুই করতে হয়।

কাজল একটা ভেজা টাওয়েল নিয়ে আসে। রোকসানার চোখ মুখ মুছিয়ে দেয়। ঘাড়ের কাছে আর বুকের মাঝেও তোয়ালে বুলিয়ে দেয়। রোকসানার বলতে ইচ্ছা করে, তোয়ালে রাখো, তোমার হাত দিয়ে মুছিয়ে দাও। কিন্তু বলে না। কাজল একটা চিরুনি দিয়ে রোকসানার চুলগুলো আঁচড়াতে থাকে। একটা পনিটেল করে দেয়। কপালে চুমু দিয়ে একটা টিপ পরিয়ে দেয়। রোকসানার চোখে পানি আসে।

-কী হলো?

-ঢাকা খুব অসুস্থ।

-কে?

-এই শহর, এই ঢাকা শহরের যক্ষ্মা হয়েছে।

-ভালো হইছে।

-ভালো হইছে! শহরটা মরছে। তোমরা কেউ কিছু করবা না। ধুঁকতে ধুঁকতে শহরটা মরে যাবে?

-ওঠো, হেলান দাও, নাশতা দেই।

-উঠব না। হেলান দিব না। নাশতা খাবো না।

-প্লিজ কুসুম।

কাজল বিয়ের আগে রোকসানাকে কুসুম ডাকত। বিশেষ করে আদরের মুহূর্তেগুলোতে। ইদানীং আবার কুসুম ডাকে। কুসুম ডাকটার মধ্যে কেমন একটা ওম আর উষ্ণতা আছে। যেন হালকা শীতের মধ্যে একটা পশমি চাদর।

অসুখের অনেক সুবিধাও আছে। বাড়তি আদরযত্ন পাওয়া যায়। ওষুধ-পথ্য-সেবার মধ্যে কত প্রেমই না লুকিয়ে থাকে। কাজল এখন আদরে-যত্নে ঢেকে রাখে রোকসানাকে পশমি চাদরের মতো।

কিন্তু ঢাকার সেবাযত্ন কে করবে? ঢাকার চিকিৎসা কে করবে? ঢাকা তো একটা বিরাট পতিতালয়ের মতো, এখানে সবাই আসে, ফুর্তি করে, টাকা ওড়ায়। তারপর লাভ কিংবা লস নিয়ে চলে যায় যে যার পথে। এই পতিতালয়ের শরীর আছে, মাংস আছে, ভোগ আছে। কিন্তু লেবুর শরবত নাই, শিউলি ফুল নাই, গুড়ের ক্ষীর নাই। রোকসানা ভাবে, এই শবেবরাতের

রাতে ঢাকার জন্য বিশ রাকাত নফল নামাজ পড়বে সে। কেমন করে সে নামাজ পড়বে? জায়নামাজে তো বসতে পারবে না। নানার জায়নামাজটা তার কী প্রিয় ছিল!

সেটা ছিল উনিশশ পঞ্চাশ-টঞ্চাশের কথা। তখন নানা হজে গিয়েছিল। তখনকার হজ এত সোজা ছিল না। জাহাজে করে যেতে হয়, পায়ে হাঁটতে হয়, উটের পিঠে চড়তে হয়। নানাজান ৭৮ বছর বয়সে হজে গেলেন। তখনকার দিনে হজে যাওয়া এক অর্থে মৃত্যুর প্রস্তুতি নেওয়া। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হজে যেতে হতো। নানাজান ঠিকই হজ থেকে ফিরলেন, সুস্থ-স্বাভাবিক। তার চেহারায় কেমন একটা মিষ্টি-তারুণ্য চলে এলো। গায়ের রং আরো টকটকে। চোখে সুরমা দিয়ে, মুখে মিষ্টি পান দিয়ে পাঠ করতেন, 'ইয়ুবাশিরুহু রব্বুহুম বিরহামতিম মিন্হু অরিদ্বওয়া-নিও অজ্বান্না-তিল্ লাহুম্ ফিহা-না'ঈমুম মুকীম।' কে জানে, প্রতিপালকের এই রহমত আর সন্তুষ্টির সংবাদ নানাজানের কাছে এসেছিল কি না! হয়তো জান্নাতের স্থায়ী নিয়ামত পেতেই হজ থেকে ফেরার সপ্তাহ খানেকের মাথায় তার মৃত্যু হলো।

মৃত্যুশয্যায় নানাজান রোকসানাকে বলল, তোরে আমি মেয়ের মতো পালছি, তোর বাপের অভাব বোধ করতে দেই নাই, তুই ক, আমার কাছে কি চাস?

রোকসানা চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, তুমি ঠিক হয়ে যাও, সুস্থ হয়ে ওঠো নানাজান। তখন রোকসানার চোখে অনেক জল ছিল। নানাজান তার হাতটা ধরে বললেন,

-আমি ঠিক আছিরে পাগলি, এর চেয়ে বেশি সুস্থ ছিলাম না কখনো, যাইরে, আমার ডাক আসছে। তোরা কান্নাকাটি করিস না। আমি সুখের দেশে যাইতেছি।

-তাইলে তোমার জায়নামাজটা আমারে দিয়া যাও।

-আইচ্ছা। ফি আমানিল্লাহ।

এইটা ছিল নানা জানের মুখের শেষ কথা। রোকসানা আজও জানে না, কেন সে জায়নামাজটা চেয়েছিল। সে নামাজি না। কালেভদ্রে দুয়েক ওয়াক্ত নামাজ পড়েছে হয়তো। কিন্তু নানাজানের কাছে জায়নামাজটা কেন চাইল সেটা আজও রহস্যময়। তবে মক্কা থেকে আনা মখমলের সবুজ জায়নামাজটা বড়ই সুন্দর, কোমল। বসলে মনে হয়, এক অলৌকিক মাঠে বসে আছে সে।

জানালার সামনে দিয়ে যে মাঠটা দেখা যেতো সেটা কারা যেন চট দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। সম্ভবত মসজিদ কমিটি। চটের ফাঁকফোকর দিয়ে যতটুকু দেখা যায় তাতে ধারণা করা যায়, মাঠের ভেতর খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছে। মনে হয়,

মাঠটার সার্জারি চলছে। এই মাঠ কি ডেভলপারদের দিয়ে দেওয়া হবে? দীর্ঘদিন মাঠটায় সবুজ ঘাস হয় না। দীর্ঘদিন এই মাঠে সবুজ শিশুরা আসে না। মাঠের বোধহয় আর প্রয়োজন নেই। হাতে হাতে মোবাইল আছে গেম খেলার জন্য।

-ওঠো, কুসুম। আমাকে অফিস যেতে হবে না?

-তুমি চাকরিটা ছেড়ে দাও।

-বলো কি! খাবো কী?

-অন্য কিছু করো।

-কী করব?

-আর যাই করো এই শহরটাকে হত্যা করো না।

-আমি! আমি এই শহরটাকে হত্যা করছি?

-হুম। তুমিও একজন ষড়যন্ত্রকারী। হত্যাকারী। তোমাদের ফ্যাক্টরি বুড়িগঙ্গাকে খাচ্ছে। তোমাদের কষ্ট হয় না, বুড়িগঙ্গাটাকে শ্বাস রোধ করে মারতে?

কাজলের খুব রাগ ওঠে। কত আর সহ্য করা যায়। সারাদিন ফ্যাক্টরির হিসাবনিকাশ, লেবারদের সাথে হাউকাউ, তারপর ঘরে ফিরে আসা। একটা কাজের লোক নেই। ডাল-ভাত রান্না, রোকসানার ওষুধ পথ্য, সবকিছু তাকে একা দেখতে হয়। একটা ছুটা বুয়া ছিল, ঘরদোর ঝাড়মোছ আর কাপড় ধুত। তিন কাজে পনেরোশ টাকা। সেও এখন নেই। এইসব ঝামেলার মাঝে রোকসানার কথা-বার্তা, পাগলামি তার অসহ্য মনে হয়।

ডাক্তার নজরুল অবশ্য বলেছিল– আপনার খুব কষ্ট হবে। মানুষ পঙ্গুত্বকে সহজে মেনে নিতে পারে না। আপনার স্ত্রী আবেগি মানুষ। তার আরও কষ্ট হবে। আপনাকে মানিয়ে চলতে হবে। আমরা শুধু রোগীর শারীরিক বেদনা দেখি, মানসিক কষ্টটা দেখি না।

কাজলের ইদানীং খুব বলতে ইচ্ছা করে, রোগীর সেবাকারীরও কষ্ট হয়, শারীরিক, মানসিক– সেটা কি কেউ দেখে? খুব বড় একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে ছোট্ট একটা হাসি দেয় কাজল।

-দেখো কুসুম, শহরের আলাদা কোনো প্রাণ নেই। মানুষই হলো শহর। শহরের শরীর বলো, মন বলো– মানুষই সব। মানুষ বাঁচলেই শহর বাঁচবে। ওই যে পুরো শহরটা ধ্বংস হয়ে গেল, রাতারাতি, সেই পম্পেই শহরের মানুষগুলো বেঁচে থাকলে শহরটা ঠিকই বেঁচে উঠত।

-জানো, নিমগাছটা কেটে ফেলেছে?

-কোন নিমগাছ?

-পাশের বাড়ির বড় নিমগাছটা। ওখানে ফ্ল্যাট হবে।

-বনফুলের নিমগাছটার কথা মনে আছে?

-আমরা যখন প্রেম করতাম, তখন তুমি আমাকে এ গল্প পড়ে শুনিয়েছিলে, টিএসসি'র বারান্দায়।

-এখন বুঝি আমরা প্রেম করি না।

-না। অসুস্থ শহরে প্রেম হয় না।

-কী বলছ, এসব! আমি তো তোমাকে ভালোবাসি কুসুম। আমাদের প্রেম...

-ওই দেখো!

-কী!

-দেখো জানালা দিয়ে।

-কী দেখব?

-আমার পাশে বসো।

কাজলের হাতে সময় নেই। তাকে যেতে হবে নদীর ওই পারে। কেরানিগঞ্জের ফ্যাক্টরিতে বসে সে। তবু রোকসানার পাশে বসে। রোকসানা ধারা বর্ণনার মতো বলতে থাকে। যেন তার জানালাটা একটা সিনেমার পর্দা।

-ওই দেখো ছোট্ট মেয়েটি। ওর পিঠের ওপর কত বড় বোঝা!

-ওটা তো স্কুল ব্যাগ।

-হুঁ, বিদ্যার বোঝা। বোঝার ভারে ওর বেণি দুটোও দোলে না। কী ক্লান্ত মেয়েটি? ওকে কি কেউ তাল শাঁস কিনে দেয়? ওকে কি সবাই খরগোশ আর কচ্ছপের গল্প শেখায়? দৌড়াও মা, বিশ্রাম নিও না, আরাম করো না, তাহলে কচ্ছপ তোমার আগে চলে যাবে। প্রতিযোগিতা চলছে। জীবন এক দৌড়। আর ওই দেখো, ওই টিংটিংয়া লোকটিকে। কোনো দিকে না তাকিয়ে রাস্তা পেরুচ্ছে। কি ব্যস্ত! পাশের লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো। যেন ফুটবল ময়দান। একটা অদৃশ্য বলের দিকে ছুটছে। আর ওই দেখো, মোবাইল টিপতে টিপতে রাস্তা পেরুচ্ছে। এই বুঝি কলার খোসায়...

-এবার যে আমাকেও ছুটতে হবে কুসুম।

-সবাই ছুটছে। এই শহরে সবাই ছুটছে। শহরটা যে ধুঁকে ধুঁকে মরছে সেটা কেউ দেখছে না। হয়তো আমি পঙ্গু বলেই...

-ওই কথাটা আর কখনও বলো না। তোমার পায়ে পড়ি...

-আমার পা নেই।

কাজল আর কিছু বলতে পারে না। ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে। সিনোমার স্লোমোশন দৃশ্যের মতো ধীরে ধীরে ওঠে। রোকসানার কপালে আরেকটা চুমু খেয়ে বেরিয়ে যায়।

রোকসানা এখন বন্দী। কাজল বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে যাবে। এখন নিরবচ্ছিন্ন একাকিত্ব গ্রাস করবে রোকসানাকে। সে হাতে মোবাইলটা তুলে নেয়। ফেসবুক ঘাঁটতে থাকে। কি এক অদ্ভুত প্রদর্শনপ্রিয় সোস্যাল মিডিয়া। কেউ খাচ্ছে, কেউ বেড়াচ্ছে, কেউ সাজগোজ করছে, কেউ কবিতা লিখছে... সবাই যার যার মতো নিজেদেরকে গুরুত্বপূর্ণ দেখাতে ব্যস্ত। অথচ কেউ খেয়াল করছে না, ঢাকা শহরটা মরে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে। শহরটা মরে গেলে মানুষ কি বাঁচবে?

এখন যক্ষ্মায় কেউ মরে না, কিন্তু ঢাকা শহরটা মরবে। অবহেলায় মরবে, যক্ষ্মায় মরবে, ধোঁয়ায় মরবে, ধুলায় মরবে। এই শহরের পানি, বাতাস ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে উঠছে। এই শহরের গা বেয়ে উঠে যাওয়া পিঁপড়ার মতো মানুষগুলো ক্রমশ আত্মহত্যা করছে।

রোকসানা চিৎকার করে, গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে চিৎকার করে, বাঁচাও, বাঁচাও, এই ঢাকা শহরটাকে বাঁচাও।

ফ্ল্যাটবাড়ির বন্ধ দরজার চিৎকার ঘরের মধ্যেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে সে। রোকসানার চিৎকার রোকসানার মতোই পঙ্গু, কোথাও পৌঁছায় না। রোকসানা যদি চিৎকার করতে করতে এ ঘরে মরেও পড়ে থাকে কেউ টের পাবে না, কেউ খোঁজ নেবে না।

এই মৃতপ্রায় শহরে কেউ কারো খোঁজ নেয় না কোনো দিন। এখানে সবাই পঙ্গু, বন্দি। এখানে সবাই অসুস্থ।

# দুর্ঘটনা

খোলা রিকশাটাকে পাল তোলা নৌকা মনে হচ্ছিল। মেশিনের রিকশাটা যেন বাতাস আর দুরন্ত ঢেউ কেটে চলছে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে। ঢাকায় ফাঁকা রাস্তা পেলে যেকোনো চালকই যেন এত দিনের আটকে থাকা জামের ক্ষোভ পুষিয়ে নিতে চায়। আজ বিকালের বাতাসটা কোন দিক থেকে এসেছে কে জানে, তবে বাতাসে কোনো এক অচেনা ফুলের গন্ধ আছে! বাতাসে ফুলের গন্ধ এই শহরে বড়ই বেমানান ও বিস্ময়কর। এই রকম বাতাসে পাষণ্ডেরও প্রেমিক হতে মন চায়, অথচ বুবুন বিরক্ত। সে চোখ-মুখ কুঁচকে সার্ফিং করে যাচ্ছে। মোবাইলের স্ক্রিনে একের পর এক ফ্রি ই-বুক খুঁজে যাচ্ছে।

বুবনের মেজাজ ভালো নেই। ইদানীং বাইরে বেরুলেই তোতাকে সঙ্গে জুড়ে দেয় মা। বুবুন বুঝতে পারে না ৯ বছরের এই পিচ্চি ছেলেটা তার কি কাজে দেবে, নাকি মা তোতাকে রেখেছে ওর ওপর নজরদারি করতে! বুবুনের বিরক্তিটা আরো বাড়ে তোতার পা নাচানো দেখে।

বুবুন রিকশায় হুড তোলা পছন্দ করে না। সঙ্গে ফেউ রাখাও পছন্দ করে না। মানুষ কি আর সব পছন্দ-অপছন্দ মানতে পারে? বুবুন তখন রিকশায় হুড তুলে বসা, মোবাইলে সাফিং করছিল আর ফেউ হিসাবে পাশে বসে থাকা তোতা পা নাচিয়ে যাচ্ছিল। মানুষ কেন পা নাচায়, হোয়াই পিপল মুভ দেয়ার লেগ, শ্যাকিং লেগ হেভিট ইত্যাদি লিখে গুগল সার্চ দেয় বুবুন। কিন্তু সার্চ ইঞ্জিনের দিকে মনোযোগ দিতে পারে না। কারণ রিকশাটা চলছিল বেয়ারার মতো। ইদানীং এই মেশিনের রিকশায় ভরে গেছে ঢাকা শহর। আর অশিক্ষিত রিকশাওয়ালাগুলো হাতে গতি পেয়ে ট্রাক ড্রাইভারদের মতো বেপরোয়া হয়ে গেছে। বুবুন ইতোমধ্যেই কয়েকবার রিকশাওয়ালাকে বলেছে, বামে চাপিয়ে চালাতে, কিন্তু কে শোনে কার কথা! ছুটির দিনে ফাঁকা রাস্তা

পেয়ে, সে সমানে ওভারটেক করে যাচ্ছে, একটু জাম দেখলেই রং সাইডে রিকশা ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এমনতিই মেইন রোডে তার আসার কথা না। নিজেই বলেছিল, আপা টাইট হইয়া বসেন, চিপাচাপা দিয়া যামু গা।

পল্টনের বাঁকটা নিতে গিয়েই ঘটনাটা ঘটল। অনেকক্ষণ আটকে থাকার পর সিগ্যনাল ছেড়ে দিতেই মেশিনের রিকশাটা হুড়মুড় করে টান দিলো, আর অন্যপাশে সিগ্যনাল পড়ে যাচ্ছে দেখে মিনিবাসটা টান দিলো চরম তাড়াহুড়ায়। একটা বোমা ফাটার মতো আওয়াজ হলো, সম্ভবত রিকশার চাকা ফাটা কিংবা রিকশাওয়ালার খুলি ফাটার শব্দ।

বুবুন ছিটকে পড়ল আইল্যান্ডের ওপর।

তোতা রাস্তায় পড়ে থাকল পরিত্যক্ত কলার খোসার মতো।

## দুই

সড়ক দুর্ঘটনা এই শহরে নতুন কিছু না। প্রতিদিনই ঘটে। তবে আজকের দুর্ঘটনাটি এক কথায় মারাত্মক। একদম ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে এত বড় দুর্ঘটনা কমই ঘটে। দুর্ঘটনার ছোট-বড় মাপা হয় আদতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দিয়েই।

বাসওয়ালা পালাতে পারল না। উৎসাহী জনগণের হাতে সে প্রথমেই এক চোট মার খেলো। বাসের যাত্রীরা অবশ্য গাঁইগুঁই করছিল। তারা রিকশাওয়ালার দোষ দিচ্ছিল।

একজন বলে উঠল, আশ্চর্য মেশিনের রিকশা কেন এখানে ঢুকেছে। এদের লাইসেন্স নেই, ট্র্যাফিক রুলস জানে না, কিন্তু এদের হাতেই মেশিন চালিত বাহন! কে চালু করেছে এই ঢাকা শহরে মেশিনের রিকশা, কেন চালু করেছে?

আরেকজন বলে উঠল, ওই মিয়া, খালি ফুটানির কথা, গরিব মানুষ খাইব কী! এত যে আইনকানুন দেখান, বাসের ফিটনেস আছে? হে না হয় অশিক্ষিত তাই বলা আপনে চাপা দিয়ে দিবেন!

হইচই শুরু হয়ে গেল। নানাজনের নানা বিশ্লেষণ, মতামত বর্ষণ শুরু হলো। ট্র্যাফিক সার্জন এগিয়ে এলো। সে ইতোমধ্যেই বাসওয়ালাকে উদ্ধার করল মারমুখী জনগণের হাত থেকে। জনতার ভিড় থেকে এক সুযোগে চৌকশ একজন বুবুনের পার্স ও মোবাইলটা সরিয়ে নিরীহ মুখে সরে গেলো। একজন তোতাকে তুলে ধরল। সে গলা কাটা গরুর মতো গোঁ-গোঁ করছে। বুবুন অবশ্য অজ্ঞান। তাতে অবশ্যই ভালো হয়েছে। বীভৎস দৃশ্য তাকে

দেখতে হচ্ছে না। এদিকে রিকশাওয়ালার থ্যাঁতলানো শরীর আর ছিটকে পড়া মগজের দিকে কেউ তখনো মনোযোগ দেয়নি। যখন মনোযোগ দিলো তখন আবার সবাই বাসওয়ালার দিকে ছুটে যেতে চাইল। রিকশাওয়ালার থ্যাঁতলানো মাথাটা আর বাসওয়ালার মুখটার মস্তাজ তাদেরকে ক্ষুব্ধ করছিল হয়তো।

একদল উৎসাহী লোক ধরাধরি করে বুবুন আর তোতাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলো। তোতার পাঁজরের হাড় ভেঙে গেছে কয়েকটা, পা দুজায়গায় ভাঙা, হাত এক জায়গায়। মাল্টিপল ফ্রেক্চার এ- ইনজিউরি। ঢাকা মেডিকেল থেকে তোতাকে পঙ্গুতে নিয়ে যেতে বলা হলো। যথাবিহিত ঢাকা মেডিকেলের অর্থোপ্যাডিকে সিট খালি নাই। অচেনা দুই তরুণ নিজ দায়িত্বেই একটা সিএনজিতে করে তোতাকে পঙ্গুতে নিয়ে গেলো। এই শহরে কিছু অকাজের লোক থাকে যারা হুট করে বিপদে-আপদে কাজ করে। দুটো আয় রোজগারের জন্য তারা পথে পথে ঘোরে কিন্তু মানুষের বিপদে কোনো লাভ-ক্ষতির চিন্তা ছাড়াই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। তেমনি অচেনা দুজন তোতাকে নিয়ে গেলো পঙ্গু হাসপাতালে। আর বুবুনের ইতোমধ্যেই জ্ঞান ফিরেছে। তার কপালে তিনটা আর কনুইয়ের কাছে দুটো সেলাই পড়েছে, আর দুয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে। ব্যস, এর বেশি কিছুই হয়নি। জ্ঞান ফিরতেই সে চিৎকার করতে লাগল, আমার মোবাইল, আমার মোবাইল! একজন ওয়ার্ড বয় ছুটে এলো, আপনের সাথে তো কিছু আছিল না বইন, আপনের অ্যাকসিডেন্ট হইছে।

বুবুন বললো, প্লিজ, আমাকে একটা মোবাইল ফোন জোগাড় করে দিন, আমি ফোন করব।

-আপনে নামবার বলেন, আমি ব্যবস্থা করতাছি।

বুবুন নম্বর বলে।

## তিন

জাকির সাহেব ফোন পেয়ে দিশাহারা হয়ে গেলেন। প্রথমেই সব রাগ গিয়ে পড়ল বউ মিথিলার ওপর। তিনি গাড়িতে বসে বউকে ফোন দিলেন।

-কতদিন বলেছি, মেয়েকে একা বের হতে দেবে না!

-কেন, ও তো তোতাকে নিয়ে বের হয়েছে।

-তোতা, হু ইজ তোতা, ননসেন্স! একটা গ্রাম্য বাচ্চা ছেলে সঙ্গে দিয়ে দিলেই হলো! গাড়ি ছাড়া কেন বের হতে দিয়েছ?

-তোমার ড্রাইভার না আসলে আমি কী করব? কিন্তু হয়েছেটা কী?

-বুবুন অ্যাকসিডেন্ট করেছে।

-কি!

-উত্তেজিত হয়ো না। তেমন কিছু হয়নি। আমি যাচ্ছি।

-আমিও যাব।

-আমিন সাহেবের গাড়িটা পাঠিয়েছি। ওটায় আসো।

ফোনটা রেখেই তিনি পিএস নীলাঞ্জনাকে একটা ধমক দিলেন। দাঁড়িয়ে কী দেখছ! হাসান সাহেবকে খবর দাও, তৌহিদ সাহেবকে খবর দেও। হাসান সাহেব তাদের লিগ্যাল অফিসার আর তৌহিদ সাহেব তাদের কোম্পানির নিয়োগপ্রাপ্ত ডাক্তার। নীলাঞ্জনা বুঝতে পারছে না, এখানে হাসান সাহেবের কাজ কী!

## চার

ইমার্জেন্সির নোংরা স্ট্রেচারটা আর সহ্য হচ্ছিল না বুবুনের। সে উঠে এসে পায়চারি করছিল। এখন তার শরীরে কোন ব্যথা নেই। কিন্তু রিক্সাওয়ালা আর তোতার কথা মনে পড়ছে তার। কে যেন বলেছে, রিক্সাওয়ালাটা মারা গেছে। তোতাকে পাঠানো হয়েছে অন্যত্র। সে কি বেঁচে আছে? বুবুনের কোনো ব্যথা বোধ নেই, কিন্তু আতঙ্ক তাকে গ্রাস করে আছে। নিজের হাত-পা'কে তার অচেনা মনে হচ্ছে আর কেমন যেন ঝাপসা লাগছে সবকিছু।

জাকির সাহেব ইমার্জেন্সিতে ঢোকার মুখেই বুবুনকে দেখে ছুটে আসেন। বুবনের বিবর্ণ মুখ দেখে তিনি আঁতকে ওঠেন। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে জানতে চান, কী হয়েছে, দেখি মা।

তিনি বুবুনের কপাল আর হাতের ব্যান্ডেজ দেখলেন।

-কোথায় ডিউটি ডাক্তার কোথায়? এই তুমি কে?

-বাবা ওকে বিশটা টাকা দাও। ওর মোবাইল থেকে ফোন করেছি তোমাকে।

ওয়ার্ড বয় জাকির সাহেবের স্যুট-কোট দেখেই বুঝতে পারলেন এরা হোমরাচোমরা। সে কোনো রকম তোতলামি করে বলল, টেকা লাগব না স্যার।

জাকির সাহেব ওর দিকে পাত্তাও দিলেন না। এক হাতে একটা পাঁচশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন। তার বাড়িয়ে দেওয়া হাতের মধ্যেই আদেশ আছে যেন। ওয়ার্ড বয় চুপচাপ টাকাটা নিল। আর জাকির সাহেব একজন

অ্যাপ্রন পরা ডাক্তারকে হাঁক দিলেন, এই যে আপনি এইদিকে আসুন। এইটা কি হাসপাতাল? ছি! সো আনহাইজেনিক! এটাকে ইনফেকশনের ডিপো। ডিরেক্টর কোথায় তাকে ডাকুন। হোয়ার ইজ দ্য ডিরেক্টর। আই নিড হিম। ইমিডিয়েটলি।

সদ্য ইন্টার্নি করা ডিউটি ডাক্তার মামুন এগিয়ে আসে। সে জহির সাহেবকে চিনতে পেরেছে। এ দেশের নামকরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের একজন, সিআইপি। ঢাকা শহরে দুর্ঘটনার এই এক সমস্যা। হুটহাট বড় মানুষরা অনেক সময় সরকারি হাসপাতালে চলে আসে। আর তারা আসা মানেই হম্বিতম্বি, হইচই। মামুন মনে মনে আতঙ্কিত হয়। এখনই হয়তো সাংবাদিক-টাংবাদিক, মন্ত্রী-ফন্ত্রী চলে আসবে। তার আজ একটু আগে বাসায় যাওয়ার কথা, ছেলেটার শরীর ভালো নেই। কদিন আগে ডেঙ্গু থেকে ভুগে উঠল তার চার বছরের ছেলেটা। ডেঙ্গুর ডেথ রেশিও এখন অনেক বেশি। যাক, ছেলেটার জীবন রক্ষা পেয়েছে। আজ মে বায়না করেছিল, তাকে নিয়ে ঘুরতে যেতে হবে। কিন্তু ঘুরতে যাওয়া তো দূরের কথা, আজ মনে হয় ভালোই বিপদে পড়তে হবে। কে যেন লিখেছিল, দুর্ঘটনা হলো ভুল জায়গায়, ভুল সময়ে, ভুল মানুষের উপস্থিতি। এখন এইসব ভুল জোড়াতালি দিতে হবে তাকে। মামুন মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করে।

-স্লামালেকুম। আমি ওনার স্টিচ দিয়েছি। আমি ডাক্তার মামুন।

-কী স্টিচ দিয়েছেন?

-স্যরি?

-কসমেটিক স্টিচ দিয়েছেন? ওর কপালে কি দাগ থেকে যাবে?

-না, আমরা তো সাধারণত কসমেটিক স্টিচ দেই না, তবে ওনার...

-সাধারণত! আমার মেয়ের ব্যাপারটি আপনার কাছে সাধারণ মনে হয়েছে!

-বাবা, তোতা...

-হ্যাঁ, ওর সঙ্গে যে আমাদের কাজের ছেলেটি ছিল সে কোথায়?

-ওকে পঙ্গুতে রেফার করা হয়েছে। ওর বাম পাটা হাঁটুর ওপর থেকে একদম ফেলে দিতে হবে, ডান পা'র অবস্থাও ভালো নয়। পাঁজরের দুটো হাড়ও ইনজিওউরড। ব্লিডিং হয়েছে প্রচুর, লাইফ থ্রেট আছে।

-আচ্ছা, সেটা পরে দেখছি। এখন বলুন, আমার মেয়ের পরবর্তী চিকিৎসা কী?

-ওকে আপনি বাসায় নিয়ে যেতেন পারেন, শি ইজ আউট অব ডেঞ্জার।

-কী বলছেন আপনি? পড়ে মাথায় আঘাত পেয়েছে! আপনি ব্যাপারটাকে আমল দিচ্ছেন না? সিটি স্ক্যান করিয়েছেন?

-জি না।

-জি না! মাই গড! কী পাশ আপনি? না, না, আপনার সঙ্গে কথা বললে হবে না। আপনার ডিরেক্টরকে খবর দিন, ইমিডিয়েটলি আসতে বলুন। ওকে আমি বামরুগাদে নিয়ে যাব।

-স্যার, আপনি শান্ত হোন। ওনার তেমন কিছু হয়নি। আমরা যতটুকু করেছি সেটাই ওনার জন্য যথেষ্ট ...

-ডোন্ট ট্রাই টু টিচ মি... কি নাম বললেন আপনার, হ্যাঁ ডাক্তার মামুন, লিসেন ডক্টর, যা বলছি তাই করুন। ডিরেক্টরকে আসতে বলুন। এক্ষুনি। কল হিম।

কপাল ভালো যে, ডিরেক্টরকে আর আসতে বলা লাগল না। কীভাবে যেন তার কাছে খবর চলে গেছে। তিনি সঠিক সময়ে হাজির হলেন। ডাক্তার মামুন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

-এই যে মাজাহার ভাই, হাসপাতালটাকে কী করে রেখেছেন? মেয়েটা মাথায় আঘাত পেয়েছে, অথচ কোনো সিটি স্ক্যানই করানো হয়নি! আমি এসে দেখি সে বাইরে হাঁটাহাঁটি করছে।

এদিকে জাকির সাহেবের দুই কাঁধের পাশে মুনকারনাকিরের মতো হাসান সাহেব আর তৌহিদ সাহেব দণ্ডায়মান। তৌহিদ আর হাসান দুজনেই ডিরেক্টর মাজাহার সাহেবকে যথেষ্ট ঝুঁকে নীরবে সালাম দেন।

-জাকির ভাই, আমার রুমে আসুন।

-না, না, ফর্মালিটির সময় এখন না। আচ্ছা, বল তো মা, এত জায়গা থাকতে তুই এখানে এলি কেন?

-আমার তো কোনো জ্ঞান ছিল না। কারা যেন... পাপা, আমার মোবাইল, ব্যাগ এইসবও...

-মিসিং! কী একটা জাত হয়েছি আমরা! যাক, ও সব নিয়ে পরে ভাবলেও হবে, আইজিকে বললেই সব বেরিয়ে যাবে। হাসান সাহেব আপনি একটু আইজিকে ফোন দিন। মোবাইলটা ট্র্যাক করতে বলুন। মাজহার ভাই, আমি ওকে বামরুগাদে নিয়ে যেতে চাই, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে, আপনি কি কোনো রেফারেন্স দিতে পারেন?

-ব্যস্ত হবেন না। আমি দেখছি, তোমাকে দেখেছে কে মা?

ডাক্তার মামুন পাশেই ছিল। সে বড় বড় বোলচালে একটু বিরক্তই হচ্ছিল। আমাদের দেশের বড়লোকদের একটু হেঁচকি উঠলেই বিদেশে চেক-

আপ করার খায়েশ জাগে! দেশের সব ডাক্তার, সব হাসপাতাল, সব চিকিৎসাই তাদের কাছে খারাপ? তারা তো চাইলেই দু-চারটা হাসপাতাল বানাতে পারে। অথচ মরবে গিয়ে বিদেশে আর কবর হবে দেশে। যত্তসব। ছেলেটা নিশ্চয়ই উতলা হয়ে আছে। মামুন শান্ত মুখে ডিরেক্টরের সামনে গিয়ে বলে, স্যার, আমি ওনার স্টিচ দিয়েছি। টোটাল ছয়টা বাইট লেগেছে। লোকাল দিয়ে স্টিচ করেছি।

-হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক।

-সি ইজ ওকে, কমপ্লিটলি ওকে। আমি নিজে স্টিচ করেছি। অল্পবয়স্ক মেয়ে তাই আমি স্টিচ করার সময় স্কারের ব্যাপারটা খেয়াল রেখেছি। আমার মনে হয়নি কসমেটিক স্টিচ লাগবে। আর আমার মনে হয় না...

-আপনার কি মনে হয় না হয়, দ্যাটস নট ইম্পর্টেন্ট এট অল। আই ডোন্ট বিলিভ ইন ইউর ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওর। ভেরি আন হাইজিনিক এনভায়রমেন্ট। আয় মা, তুই গাড়িতে ওঠ।

জাকির সাহেব এগুতে নেন। এরমধ্যেই একজন ইন্সপেক্টর এসে সেল্যুট ঠোকে।

-স্যার, বাস ড্রাইভারটা ধরা পড়েছে। মালিককেও ধরেছি আমরা। ওরা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি। দুর্ঘটনার ওপর তো আর কারো...

-টু হেল উইথ ইউর ক্ষতিপূরণ! আই ওয়ান্ট টু সি দ্য ড্রাইভার হেংগড। এটাকে কোন দুর্ঘটনা বলা যাবে না, এটা হলো একটা হত্যাকাণ্ড এই ড্রাইভারগুলো একএক কিলার।

-স্যার, রিক্সা ড্রাইভারটা মারা গেছে।

-দেখলেন ইন্সপেক্টর! আমি আগেই বলেছি, এটা মার্ডার কেস। আপনার নাম কী?

-স্যার, ইমরুল। ইমরুল হুদা।

-ঠিকাছে হুদা সাহেব, আমি আপনার নাম বলব আইজিকে। হাসান সাহেব আপনি আইজির সঙ্গে কথা বলুন। ব্যারিস্টার ইমদাদকেও একটা ফোন দিন। শুনুন ইমরুল সাহেব এসব নিয়ে পরে কথা হবে, আপাতত আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আই নিড ইউর হেল্প। আমি মামণিকে নিয়ে কেয়ার ক্লিনিকে যাব, দয়া করে সাইরেন টাইরেন বাজান, রাস্তা ক্লিয়ার করতে করতে এগুন। যে জাম ঢাকা শহরে। ডিজগাসটিং। আয় মা। তুই কি গাড়িতে যেতে পারবি? নাকি অ্যাম্বুলেন্সে?

মাজহার সাহেব কী একটা যেন বলতে নেন। কিন্তু কাউকে আর দ্বিতীয় কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বুবুনকে নিয়ে জাকির সাহেব গাড়িতে উঠলেন।

সেক্রেটারি এবার পুলিশের গাড়িতে উঠল। ম্যাডামকে ফোন করে সে ইতোমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে তারা প্রাইভেট ক্লিনিকে যাচ্ছে। পুলিশের হর্নে রাস্তা পরিষ্কার করে তারা এগুতে থাকেন আর এদিকে ডাক্তার মামুন একটু রিলাক্স হওয়ার জন্য জোরে জোরে কয়েকবার শ্বাস ফেলেন। তবু তার একটু নার্ভাস লাগে যখন দেখে ডিরেক্টর মাজাহার স্যার তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সে মিনমিন স্বরে বলে, স্যার, আমার মনে হয় না আমরা কোন গাফিলতি করেছি। সিম্পল অ্যাকসিডেন্ট কেস। দিনে এমন দশ-বারোটা আসেই। স্টিচটাও যত্ন নিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনো স্কার থাকবে না। তবে কাজের ছেলেটার অবস্থা ভালো নয়...

-ইটস ওকে ড. মামুন, আই নো, ইউ ডিড ইউর বেস্ট। প্লিজ গো টু ইউর ডিউটি।

ডাক্তার মামুন এতক্ষণে একটা নিশ্চিন্তের নিশ্বাস নেয় বুক ভরে। মাজহার স্যারের এই একটা বিশাল গুণ, তিনি দিন শেষে তার ডাক্তারদের ওপর আস্থা রাখেন।

ডাক্তার মামুন এইবার হয়তো নিজের ছেলেটার একটু খোঁজ নিতে পারবে।

## পাঁচ

জাকির সাহেবের একমাত্র মেয়ে বলে কথা। তারা কেয়ার ক্লিনিকে পৌঁছানোর আগেই সিটি স্ক্যান থেকে শুরু করে ওটি পর্যন্ত সব রেডি। সৌভাগ্যক্রমে বুবুনের শরীরে আর কোনো আঘাত বা কোনো সমস্যা কোনো পরীক্ষাতেই ধরা পড়ল না। প্রফেসর মর্তুজা অবশ্য বন্ধু জাকিরকে জানালেন, মেয়ে শক পেয়েছে, বড় ধরনের শক, ইটস আ ট্রমা, আমার মনে হয় তোমরা বাইরে কোথাও থেকে ঘুরে আসো। কয়েকটা দিন একসাথেও থাকা হবে।

ইতোমধ্যে মিথিলাও এসে হাজির। তিনি মেয়েকে আগেই বাড়ি থেকে বার হতে দিতে চাচ্ছিলেন না। এখন সেজন্য বকতে নিলেন। কিন্তু প্রফেসর মতুর্জা বললেন, ভাবি, ডোন্ট বি হার্স উইথ হার। লেট হার বি চিয়ার আপ।

হাসান সাহেব বললেন, চিয়ার আপ তো হতেই হবে! শোনো বুবুন, আমার একটা কথা মন দিয়ে শোনো, লাইফ ইজ আ জার্নি। আ বিগ জার্নি। আর চলার পথে দুর্ঘটনা হবে, কেউ আহত হবে, কেউ নিহত হবে...

-পাপা, নিহত কী?

-নিহত মানে মারা যাওয়া।

-পাপা, তোতা কি মারা গেছে?

-ডোন্ট ওরি এবাউট দ্যাট। তোতাকে নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। হাসান সাহেব আর তৌহিদ সাহেব পুরো ব্যাপারটা দেখবে। যেটা তোমার জানা দরকার সেটা হলো, জীবনে দুর্ঘটনা থাকবে। তোমার কাজ হলো দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা।

-থাক না জাকির, মেয়েটাকে এসব জ্ঞান পরে দিও।

-ঠিক, চলো, আমরা আগে বাড়ি যাই। ইউ নিড টু হেভ সাম ফ্রেস জুস।

মুর্তজা বললো, আরে তাড়া কীসের বন্ধু, বসো! জুস আমি আনাচ্ছি মেয়ের জন্য, এখানে ভালো ফ্রেশ জুস পাওয়া যাবে। একটা অরেঞ্জ জুস খাও মা। জাকির, তুমিও একটু কফি খাও? ভাবি কি খাবেন বলুন? আমার এখানে তো আর আপনারা এমনি এমনি আসবেন না।

-না বন্ধু, অন্য সময় আসবোনে। বাসায় যাই। ইউ নিড টু ফ্রেশেন আপ। কাল ক্লাবে এসো। কথা আছে।

জাকির সাহেব মিথিলাকে আর বুবুনকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। আর ডাক্তার তৌহিদ ও লিগ্যাল অ্যাজভাইজার হাসানকে নির্দেশ দিলেন পঙ্গু হাসপাতালে গিয়ে তোতার খোঁজ নিতে।

## ছয়

পঙ্গু হাসপাতালে তিনজন ডাক্তার থাকলে ত্রিশজন রোগী থাকে। বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা যেকোনো ব্যাপার না শুধু এই একটি হাসপাতালে আধ ঘণ্টা দাঁড়ালেই তা বোঝা যায়। হাত-পা কেটে ফেলা এখানে এত অবলীলায় আর এত ঘনঘন হয় যে টুকটাক এম্পুটিউশন নার্স-বয়রাও করে ফেলতে শিখে গেছে।

তৌহিদ পঙ্গু হাসপাতালের সাথে পূর্বপরিচিত। কিন্তু হাসান সাহেব এখানে ঢুকে দিশাহারা হয়ে যান। ইমার্জেন্সিতে তোতা নামে কারো এন্ট্রি নেই। অন্য আরেক রুগির আত্মীয় সূত্র ধরে সে জানতে পারে একটি বালককে দুজন লোক এখানে ধরাধরি করে এনেছিল দুয়েক ঘণ্টা আগে। তার অপারেশন হয়েছে, এখন আইসিইউতে আছে।

কিন্তু আইসিইউতেও গিয়ে তোতাকে পাওয়া যায় না। নার্স-ডাক্তার সবাই ব্যস্ত। তৌহিদ সাহেব নিজের ডাক্তার পরিচয়টা দিলেন, সেইসঙ্গে জাকির সাহেবের নামটাও শুনিয়ে দিলেন। পরিচয়ের মাহাত্মেই তারা এক মিনিটের ব্রিফিং দিলো। যা জানা গেলো তা খবরের ভাষায় এমন— আজ সোমবার